Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 444 – 451
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু’ : বিকল্প আখ্যানে নিম্নবর্গের ইতিহাস

ড. আনিসুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : anisurrahaman1988@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Cultural practices, New insight, Traditional historical, Subaltern, Hegemonic rule, Activist writer, Chaitanya-movement, alternative narrative.

Abstract

The world's society, politics, economy, history and cultural practices[1] have caused a great stir in the seeding of 'Subaltern Studies' or 'Subaltern Historiography' in the post-colonial era. This approach sheds new insight[2] on the blind alley of traditional historical[3] and literary practice. Antonio Gramsci (1890-1937), one of the Italian Marxist thinkers, used the term 'Subaltern'[4] at first in Italian language his 'Prison Notebooks' (1929-35). The term 'Subaltern' is relative. Therefore, in our discussion, we have meant the term as lower class or marginal class in respect of caste, gender, occupation, wealth, education or in any other way accordingly. Our argument is that under the hegemonic rule[5] of Bengal for a long time, the underprivileged, the deprived, the helpless agricultural labourers, the land serfs, the labourers, the untouchable tribal peoples and the floating people without a livelihood are called the lower class or marginalized people.

Three decades before the Subaltern Historiography, the activist writer[6] Mahasweta Devi spoke and wrote about them in different ways. He didn't read Marx, he didn't read Gramsci. He has read People, he has understood the hunger of people. The story of Aranya Chuad's rise to fame as a poet in the rich background of Chaitanya-movement[7] in medieval era is narrated in the novel 'Life and Death of Poet Bandhyaghati Gani' (1967). Mahasweta Devi, who was interested in the history of Bengal in the 16th century. He created history in an alternative narrative[8] with life and poetry as inspiration. The main subject of the narrative is the dream, struggle, pursuit, love, despair, failure and suffering of the caste-ruled society in the whole world that continuity can only be understood by taking a casual look around us.

Discussion

নিম্নবর্গের ইতিহাস : প্রেক্ষিত ও প্রবণতা :

ঔপনিবেশিক-উত্তর কালপর্বে বিশ্বের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতিচর্চার জমিতে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' বা 'নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা' চিন্তার বীজায়নে ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘদিন ঐতিহ্যলালিত ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার চর্বিতচর্বণের অন্ধ গলিতে এ দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব আলোকসম্পাত করেছে, ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার ব্যাখ্যায় নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে। মোটামুটি ভাবে বিশ শতকের আটের দশক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত উপমহাদেশে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার যে ধারণা প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে, তাতে বদলে গিয়েছে দীর্ঘদিনের ইতিহাসচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত। ভারতে রণজিৎ গুহ, দীপেশ চক্রবর্তী, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, জ্ঞাণেন্দ্র পান্ডে, শাহিদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, ডেভিড হার্ডিম্যান, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুমিত সরকার প্রমুখ কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকেরা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে তাঁদের চর্চিত চিন্তা ও ভাবনার আলোকে রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও শিল্প-সাহিত্যকে দেখেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। এঁরা নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে তাঁদের ভাবনাকে উপস্থাপন করেছেন। রণজিৎ গুহর সম্পাদনায় ১৯৮২-'৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত 'সাবলটার্ন স্টাডিজ', জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের 'দি অ্যাসেন্ডেন্সি অফ দি কনগ্রেস ইন উত্তরপ্রদেশ' (১৯৭৮), গৌতম ভদ্রের 'মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ' (১৯৮১), ডেভিড হার্ডিম্যানের 'পেজান্ট ন্যাশনালিস্টস অফ গুজরাট' (১৯৮১), শাহিদ আমিনের 'সুগারকেন অ্যান্ড সুগার ইন গোরখপুর' (১৯৮৪), পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭', 'দি ল্যান্ড কোয়েশ্চন' (১৯৮৪), ডেভিড আর্নল্ডের 'পুলিশ পাওয়ার অ্যান্ড কলোনিয়াল রুল' (১৯৮৬) এবং রণজিৎ গুহর 'এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস অফ পেজান্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' (১৯৮৩) প্রভৃতি এই ঘরানাকে সমৃদ্ধ করেছে। যদিও প্রথমদিকে ঔপনিবেশিক চেতনাপুষ্ট তথাকথিত ঐতিহাসিকেরা এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থগুলি প্রকাশ ও প্রচারের পর একশ্রেণির মানুষের বৌদ্ধিক চেতনাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছে এবং এর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। 'নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা' লাভ করেছে এক প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার সিলমোহর এবং প্রচলিত ইতিহাসের ধারায় রচিত হয়েছে এক 'বিকল্প ইতিহাস' (alternative history)।

বলা বাহুল্য, নিম্নবর্গ বা ব্রাত্য অথবা প্রান্তিক-অবহেলিতের অস্তিত্ব আমাদের সমাজবিন্যাসে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান। কিন্তু 'সাবলটার্ন' বলতে যে আধুনিক ধারণা, তার আবির্ভাব অনেক পরে। ইতালির অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তাবিদ আন্তেনিও গ্রামশি (১৮৯০-১৯৩৭) প্রথম ইতালীয় 'সুবলতের্নো' (Subaltern) শব্দটি প্রয়োগ করেন তাঁর 'Prison Notebooks' (১৯২৯-'৩৫) গ্রন্থে। 'সাবলটার্ন' শব্দটি তারই ইংরাজি পরিভাষা। গ্রামশি আসলে ইতালির দক্ষিণ অংশের অনুন্নত কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী, যারা ছিল মূলত অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, তাদের তিনি 'সাবলটার্ন ক্লাসেস' (Subaltern Classes) বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে গ্রামশির তত্ত্ব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। গ্রামশি কথিত 'সাবলটার্ন' ঠিক কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা নিয়েও পণ্ডিতরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গ্রামশি 'সাবলটার্ন' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটি অর্থে সরাসরি প্রলেতারিয়েতের প্রতিশব্দ রূপে। আর অন্য অর্থে সাবলটার্ন শিল্পশ্রমিক শ্রেণি নয়; সমাজ বিন্যাসের স্তরে ডোমিন্যান্ট শ্রেণির অপর মেরুতে অবস্থিত অধীনস্থ শ্রেণি।

সাবলটার্ন-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন রণজিৎ গুহ। তিনি ছিলেন 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' গোষ্ঠীর অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পাদিত ছ-খণ্ডের 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন,

> 'Of inferior rank'...this is expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way.'[১]

আবার এর পশাপাশি সাবলটার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও নিম্নবর্গের সংজ্ঞায়ন করেছেন। তাদের বক্তব্যের সারকথা হল—সকল জনগণের মধ্যে যারা শ্রেণি, বর্ণ, জাতি, বয়স, লিঙ্গ, পেশা অথবা যে-কোনো স্তর বিভাজনের বিচারে

অধস্তন, তারাই নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক। 'নিম্নবর্গ' শব্দটি আপেক্ষিক। তাই আমাদের আলোচনায় নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক শব্দটিকে শর্তসাপেক্ষে বোঝাতে চেয়েছি। আমাদের মতামত হল আবহমানকাল ধরে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজে আধিপত্যবাদের শাসনে-শোষণে ক্লিষ্ট অন্তেবাসী, বঞ্চিত, অসহায় কৃষিমজুর, ভূমিদাস, শ্রমিক, অস্পৃশ্য আদিবাসী জনজাতি এবং জীবিকাহীন ভাসমান মানুষেরাই নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক। যেকোনো সমাজ ও দেশে এদের সংখ্যা বেশি হলেও ইতিহাস, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্যে এরা থেকে গেছে অনালোচিত ও অনালোকিত। তারা যেন নিজ বাসভূমে পরবাসী। সমাজের মূলস্রোতের ধাক্কায় দিশেহারা ও পর্যুদস্ত।

নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা আমাদের ঐতিহ্যলালিত ইতিহাস চেতনায় অনেক পরিবর্তন সূচিত করেছে। সেই পরিবর্তন কেবলমাত্র ইতিহাসের আলোচনা ও বিশ্লেষণে সীমায়িত থাকেনি; দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে বদলে গিয়েছে সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণের মাপকাঠি।

মহাশ্বেতা দেবীর ইতিহাস চর্চা :

মহাশ্বেতা দেবী সময়, সমাজ ও ইতিহাসসচেতন কর্মীলেখক। জনবৃত্ত ও গণবৃত্তের ইতিহাসচর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। প্রাথমিক পর্বে তিনি ঐতিহাসিক রোমান্সকে আশ্রয় করে লেখালেখি শুরু করলেও পরবর্তীতে ভারতবর্ষের জনবৃত্ত ও গণবৃত্তের ইতিহাসচর্চায় নিজেক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ইতিহাসচর্চা সাহিত্যস্রষ্টার আবশ্যিক মূল শিক্ষা হওয়া উচিত। তিনি সারাজীবন বিকল্প আখ্যানের পরিসরে জনবৃত্ত ও গণবৃত্তের ইতিহাসেরই অনুসন্ধান করেছেন এবং ভেঙে-চুরে দিয়েছেন প্রচলিত ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার আকল্প। তৈরি করেছেন বিকল্প ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার বয়ান। রচিত হয়েছে 'অন্য ইতিহাস'। আমৃত্যু ইতিহাসে বিশ্বাসী মহাশ্বেতা দেবী 'এক জীবনেই' আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন,

> "আমি তো ইতিহাসে বিশ্বাসী। আমার কথা জানতে হলে পিছনের কথা জানতে হবে। গাছ কি মাটি ছাড়া হয়, না হতে পারে।"[২]

ফলে বছরের পর বছর পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন গ্রাম থেকে গ্রামে, মহল্লা থেকে মহল্লায়, দাওয়ায় বসে শুনেছেন বঞ্চিত মানুষের বেদনামথিত অশ্রুত কাহিনি এবং বজ্রমুষ্টিতে পা মিলিয়েছেন তাঁদের জীবনসংগ্রামের মহামিছিলে। তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য ঘুরেছেন সরকার, পুলিশ ও প্রশাসনের দরজায়-দরজায়। নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করেছেন তাঁদের উন্নয়নকার্যে। নিজের অনুভব-বিশ্বাস, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, দর্শন-শ্রবণের মাধ্যমে জীবনের প্রত্যক্ষভূমি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে উপন্যাস রচনায় মগ্ন থাকেননি। তাদেরই একজন হয়ে সমানুভূতিতে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে গর্জে উঠেছিলেন।

জীবনে-মননে ও সাহিত্যে হার না মানা সংগ্রামী চেতনার পাশাপাশি শিল্পী হিসাবেও প্রথাবদ্ধ বিদ্যাশৃঙ্খলার বিচরণক্ষেত্রের বেড়াজাল ভেঙেচুরে, অভ্যাসের অন্ধগলিতে আলো নিক্ষেপ করে, বাংলা সাহিত্যকে করে তুলেছেন নবচেতনার বীক্ষণাগার। বাংলা উপন্যাসের বাসর সাজাতে হাত বাড়িয়েছিলেন ভিন্ন শিল্প মাধ্যমের প্রাকরণিক অভিনবত্বে। আখ্যানের ন্যারেশনকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে ব্যবহার করেছেন ইতিহাস, পুরাণ, মিথ ও ফ্যান্টাসির ভুবনকে। ফলে তাঁর সৃষ্ট কোনও শিল্পকর্মই বৌদ্ধিক ব্যায়াম চর্চার অন্তঃসারশূন্য পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনশালায় পর্যবসিত হয়নি। কার্যত প্রত্যেকটি উপন্যাসের আখ্যানের সংগ্রাম-ক্রোধ-দ্রোহ জীবনসংগ্রামের মোহনায় এসে মিশেছে। মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসবোধ ও ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে নিজেই জানিয়েছেন,

> "আমি বিশ্বাস করি, গণ ও সমাজ আশ্রিত ইতিহাসচর্চায়। ইতিহাসচর্চা আমার মতে সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক মূল শিক্ষা।"[৩]
>
> "আমার বক্তব্য, আমি সারাজীবন সেই ইতিহাসেরই অনুসন্ধান করেছি। ছাপা থাকে যে দুটো লাইন, সেটা নয়। মাঝখানের খালি জায়গাটুকু, যেখানে লোকবৃত্তের ইতিহাস আছে তাকে খুঁজে বের করি।"[৪]
>
> "ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে মানুষের অন্তর্মুখী পুরুষার্থকে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া। আর তখনি ভিতর পানে চোখ

> মেলার দরুণই অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে সমাজনীতি ও অর্থনীতি...সমাজনীতি ও অর্থনীতির মানে হল লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবনব্যবস্থা।"[৫]
>
> "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদকল্পে যে সকল আদিবাসী কৃষক সংগ্রাম বৃটিশ অনুপ্রবেশের পর ঘটেছে, সেগুলো যে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ, সেকথা স্বীকার করা হয়নি। ফলে, ভারতের ইতিহাস, যা ছাত্রছাত্রীরা পড়ে, তাতেও এদের মহান সংগ্রামগুলির ইতিহাস সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।"[৬]
>
> "জাতিটিকে (শবর) ইতিহাসে পুনর্বাসনের জন্য ...কথ্য পরম্পরার সন্ধান প্রোয়োজন, যা একদা ছিল, আজ সন্ধান মেলে না ...এই উপন্যাসে আমি শবর জাতি পরিচিতি অনুসন্ধানের কাজে প্রথম ব্রতী হলাম।"[৭]

নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার তিন দশক আগে থেকেই মহাশ্বেতা দেবী প্রকারান্তরে তাঁদের কথাই বলেছেন ও লিখেছেন। তিনি মার্কস পড়েননি, গ্রামশি পড়েননি। পড়েছেন মানুষকে, উপলব্ধি করেছেন মানুষের ক্ষুধাকে। মহাশ্বেতা দেবী যাঁদের নিয়ে লিখেছেন তাঁরা আসলে আদিবাসী বা মূলবাসী। কিন্তু আদিবাসী ও নিম্নবর্গ শব্দ দুটি সমার্থক নয়। আলাদা অর্থগত অভিব্যঞ্জনা আছে। লেখক তাঁদের কীভাবে দেখেছেন এবং 'আদিবাসী' শব্দটির মধ্যে যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে তা বলেছেন,

> "আদিবাসীদের মধ্যে সব আছে, পাহাড়ের ধৈর্য, নদীর শান্তি। প্রতি আদিবাসী যে এক মহাদেশ। কিন্তু আমরা তো তাদের জানতে চাইনি। ওদের শ্রদ্ধাও করতে শিখিনি।"[৮]

তিনি দেশচেতনা ও কালচেতনাকে গভীরভাবে দেখেছেন। দেশের বিস্তার আছে, কালের প্রবাহ আছে। ফলে তাঁর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে সময়ের দেশ। সময়ের দেশকে তুলে এনেছেন ইতিহাসচেতনায়, যে ইতিহাসচেতনা শুধু অতীত আশ্রিত নয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালও তার অঙ্গীভূত।

তিনি মনে করতেন সমাজ-ইতিহাসে মানুষ ও সভ্যতার প্রতিটি অঙ্গনে বুদ্ধিজীবী মানুষের সদর্থক ভূমিকা থাকা আবশ্যিক। তাই বুদ্ধিজীবীর দুর্বলতায়, নিষ্ক্রিয়তায়, অবক্ষয়িত মানসিকতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছেন। নিজের সময়ে দাঁড়িয়ে ইতিহাসকে খুঁজেছেন তিনি। অন্বেষণ করেননি যান্ত্রিক ইতিহাস, অন্বেষণ করেছেন মানুষের ইতিহাস। তাই তিনি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, মিথ ও ফ্যান্টাসিকে বারেবারে বিশ্লেষণ করে তৈরি করেছেন নতুন নতুন ডিসকোর্স। ১৯৫৬ সাল থেকে আমৃত্যু মহাশ্বেতা দেবীর লেখক জীবনের সারবস্তু তুলে এনে জানা যায়,

- তিনি প্রচলিত ইতিহাসচর্চার বিকল্প শুদ্ধতর ইতিহাসচর্চার প্রকল্প গ্রহণ করেছেন উপন্যাসের প্রতিবেদনে। যে ইতিহাসে লুকিয়ে আছে লোকসমাজের কণ্ঠস্বর এবং সংগ্রামী চেতনা। মৌখিক পরম্পরা, জনবৃত্ত ও গণবৃত্তের মধ্য থেকে নিঙড়ে নিতে হয় সেই ইতিহাসের সারাৎসার। আর তখনই রচিত হয় 'অন্য ইতিহাস'।
- প্রথাগত বিদ্যাশৃঙ্খলার (Studies of School) ইমারত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মহাশ্বেতা দেবী তুলে ধরেছেন Voice for Margin এবং History from below.
- "সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মান দণ্ডগুলি ভুল। সাহিত্যবিচার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার।"[৯]

মহাশ্বেতা দেবীর কথায়, কাজে, জীবনে, সাহিত্যে কোনও ফাঁক ছিল না। তাঁর সৃজনশীলতা, জীবনযাপনের শৈলী, তাঁর কলমের ভাষা প্রভৃতির মধ্যে কোনও সীমারেখা ছিল না। প্রশংসা ও পুরস্কারের তোয়াক্কা কখনও তিনি করেননি। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, বিশ্বাস করতেন মানবতার পলিটিক্সে। তিনি সর্বদা ডুবে থাকতেন মানুষের কল্যাণে।

'কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্চির জীবন ও মৃত্যু' : বিকল্প ইতিহাসের অভিপ্রায় :

মধ্যযুগের সাহিত্য, ইতিহাস ও লোকজ উপাদানকে আশ্রয় করে মহাশ্বেতা দেবীর বিকল্প ইতিহাসচর্চার পাঠকৃতিসমূহ-

- আঁধার মানিক (১৯৬৬)
- কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্চির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭)
- বিবেক বিদায় পালা (১৯৮৩)

- কৈবর্ত খণ্ড (১৯৯৪)
- ব্যাধখণ্ড (১৯৯৪)
- বেনেবউ (১৯৯৪)

মধ্যযুগের চৈতন্য-ভাবান্দোলন পুষ্ট পটভূমিতে রাঢ়-বাংলার এক অন্ত্যজ, অরণ্য চুয়াড় যুবক কলহনের কবিখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার ইতিহাস 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭) উপন্যাসের আখ্যান। এ উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন অসিত গুপ্তের কাছ থেকে এবং গ্রন্থটির নামকরণও তিনিই করেছেন। লেখক উপন্যাসটি সম্পর্কে জানিয়েছেন-

> "ওই চৈতন্যের যুগ ও কবিকঙ্কণের বই থেকে লিখি 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু'।... কবি বন্দ্যঘটীর জীবনও আমার বিচারে খুব দরকারী বই আমার কাছে।"[১০]

ষোড়শ শতকের রাঢ়-বাংলার ইতিহাসে আগ্রহী মহাশ্বেতা দেবী মঙ্গলকাব্যের পুনর্নির্মাণ করেননি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর জীবন ও কাব্যসাধনাকে প্রেরণা হিসাবে নিয়ে বিকল্প আখ্যানে ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। যে আখ্যানের মূল উপজীব্য বিষয় চুয়াড় সমাজের মানুষ বন্দ্যঘটী গাঞির কবি হওয়ার স্বপ্ন, সংগ্রাম, সাধনা, প্রেম, হতাশা, গ্লানি, ব্যর্থতা ও যন্ত্রণার করুণতম পরিণতি।

উপন্যাসের আখ্যানের নিউক্লিয়াসে রয়েছে উড়িষ্যা ও বঙ্গের সীমান্তবর্তী প্রদেশ মেদিনীপুরের মানুষের ইতিহাস। যে ইতিহাসে তিনি অন্বেষণ করেছেন লোকাচার, লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক জীবনব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের প্রভাবে কলিঙ্গ সীমান্তের আদিবাসী সমাজ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এ অঞ্চলের নিম্নবর্ণের মানুষদের জানাবার অভিপ্রায়ে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেন। এ অঞ্চলের মানুষেরাও বিভিন্ন কাব্য, গাথা, পাঁচালি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের স্পন্দনকে ব্যক্ত করেছে।

এ ছাড়া ষোড়শ শতাব্দী মোঘল বাদশা আকবরের রাজত্বকাল। দিল্লির ছত্রছায়ায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেক করদ সামন্তরাজ্য ছিল। অধুনা মেদিনীপুর জেলার মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রেওয়াজ অনুসারে সেখানে ছিল পাঁচ-ছটি ছোটো রাজ্য। এর মধ্যে একটি রাজা গর্গ বল্লভের উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী রাজ্য ভীমাদল। রাজ্য ক্ষুদ্র হলেও রাজা ছিলেন ধনী ও প্রভাবশালী। তখন রূপনারায়ণ নদীর বন্দর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি ছিল। বাণিজ্যশুল্ক কোষাগারকে ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছিল। রাজার প্রধান চিন্তা বর্ণাশ্রম প্রথা অটুট রাখা। এ কাজে সুযোগ্য সহকারী ছিলেন মন্ত্রী হরিশ রায়া।

ভীমাদল বা উড়িষ্যার বোলাঙ্গি অঞ্চলের মাঝামাঝি বিরাট ভয়াবহ নিদয়া অরণ্যে বসবাস ছিল অন্ত্যজ চুয়াড়দের। বর্ণশাসিত সমাজব্যবস্থায় শোষণ-বঞ্চনা-উপেক্ষা ও অত্যাচার ছিল তাদের ভাগ্যবিড়ম্বনা। অন্যদিকে ভীমাদলের রাজা গর্গ বল্লভের যশ-খ্যাতির প্রচার করবার জন্য কবির অভাব ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ কবি বন্দ্যঘটীর আবির্ভাব ঘটেছে। কবি এসে রাজাকে স্বপ্নাদেশের কথা বলেছে-

> "স্বপ্নে আসি কৈলা দেবী যেঞে গর্গপুরে।
> ছন্দপদে বন্দ মোরে গাহো তার সুরে।।"[১১]

রাজা কবিকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করেছেন। অল্পদিনের মধ্যে কবি 'অভয়ামঙ্গল' রচনা করে যশ-খ্যাতি লাভ করেছেন। রাজকবি ঘোষণার চূড়ান্ত মুহূর্তে কবির প্রকৃত গোত্র উন্মোচিত হয়েছে। তিনি আসলে চুয়াড়দের গোষ্ঠীপতির ভাইপো কলহন। শূদ্র হয়ে মিথ্যা আত্মপরিচয়ে কবি হওয়ার অপরাধে রাজা তাকে হাতির পদপিষ্টে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। রাজার সভাপণ্ডিত মাধবাচার্যের কন্যা ফুল্লরা ছিল কবির প্রণয়াসক্ত। তাঁর কাছেও তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়ে অভয়ার মন্দিরে আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু সেখানে আশ্রয় লাভের আগেই কবি রাজ সেনাদের হাতে ধরা পড়ে যান।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জন্মে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি কলহন। ফলে ব্রাহ্মণ সেজে কাব্য রচনা করেছিলেন কলহন। তখনকার বর্ণশাসিত সমাজব্যবস্থায় কলহনের এ ছাড়া আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় ছিল না। আর যে সময়ের কথা মহাশ্বেতা বলেছেন সেসময় ভক্তির যুগ। এসময়ে অনেক কবি, শিল্পী, গায়ক, ধর্মগুরু ও সমাজসংস্কারক উঠে এসেছিলেন অন্ত্যজ

সমাজ থেকে। তাই কবি ভেবেছিলেন 'যোগ্যতা যার পৃথিবী তার'-Career open to talent। কিন্তু বর্ণশাসিত সমাজে বর্ণগত কৌলীন্যই ছিল জাতির মাপকাঠি।

অন্ত্যজ চুয়াড় কবি বন্দ্যঘটীর নিজের পরিচয় গোপন করে কবি হতে চাওয়া ভুল ছিল। স্বপরিচয়ে 'অভয়ামঙ্গল' রচনা করলে কবির এরূপ নির্মম পরিণতি ঘটত না। আসলে অতীতকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ হয় না। নিজেদের জাতির ঐতিহ্যের কথা ভুলে কলহন রাজপ্রাসাদের নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবি' (১৯৪৪) নামে একটি উপনাস লেখেন। এ রকমই এক অন্ত্যজ কবি নিতাই-এর কবি হয়ে ওঠার কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। এ কবি ছিলেন খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙারের পৌত্র ও সিঁদেল চোরের পুত্র। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জন্ম পরিচয়কে মুছে ফেলেননি। তাঁর আত্মদর্শন ও আত্মমর্যাদা ছিল 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো'। এ কবির আত্মনির্মাণ, মানবিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত রুচি ও প্রত্যয় কলহনের থেকে বলিষ্ঠ বলে মনে হয়। কবি বন্দ্যঘটীর আত্মপ্রত্যয়ের দোলাচলতার কথা তারই স্বীকারোক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে,

> "এ নামে আমাকে অভয়ার পাঁচালি রচতে হবে, তা বিনে আমার মুক্তি নাই। আমি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ নই, বলে দেবী মিথ্যা, স্বপ্নাদেশ মিথ্যা, আমার অভয়ামঙ্গল মিথ্যা?"[১২]

কবি বন্দ্যঘটী হতে গিয়ে অতীত ভুলে গিয়েছিল। অনভিজ্ঞ যৌবন তাকে বুঝতে দেয়নি জীবনের প্রকৃত স্বরূপ, দিয়েছিল মিথ্যা উত্তরণের আশা। অতীত কাঠামোতে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে অর্জন করতে হয়। যেটা পরবর্তীকালে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছিলেন সিধু-কানু-বিরসা ও চোট্টির মধ্য দিয়ে।

মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যকে আশ্রয় করে মহাশ্বেতা দেবী নির্মাণ করেছিলেন 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসের আখ্যান। আদিবাসী চুয়াড়দের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের অমানবিক অত্যাচারের ঘটনা আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানের উপজীব্য। এক অখ্যাত চুয়াড় যুবকের কবি হয়ে ওঠা এবং ব্যর্থতার ঘৃণিত ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে এখানে। তাঁর কবি হয়ে ওঠা যতটা কঠিন ছিল, তার চেয়েও কঠিন ছিল উচ্চবর্ণের মানুষের তাকে কবি হিসাবে মেনে নেওয়াটা। লেখক চুয়াড় যুবকের স্বপ্নকে ব্যক্ত করেছেন,

> "লিখবেন তিনি, অজস্র পুথি লিখবেন! দামুন্যার মুকুন্দরামের কি আর ক্ষমতা! কৃষ্ণদাস কবিরাজের কি আর খ্যাতি! চণ্ডীদাস প্রেমের কথা কি লিখতে পারে! কবি বন্দ্যঘটি গাঞি তাদের চেয়ে, তাদের সকলের চেয়ে বড় হবে।"[১৩]

কিন্তু জাতের নামে বজ্জাতির বেড়াজাল তাঁর কবিত্বের পথে উত্তরণের বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং অবশেষে স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজের কর্ণধার রাজা গর্গ বল্লভ ছিলেন রক্ষণশীল ও ধর্মভীরু। তিনি কবিকে রাজসভায় আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং দলিত-দরিদ্র সমাজের কবি বন্দ্যঘটী রাজসভায় আশ্রয় পেয়ে কবিত্ব শক্তির প্রমাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু দলত্যাগী ছদ্মবেশী কবি বন্দ্যঘটী নিজের জাতের ও সমাজের কথা লেখেননি। রাজার দেওয়া সংবর্ধনা সভায় তাঁর আসল পরিচয় ব্যক্ত হয়। ভয়ংকর বন্যার মতো অনেক চুয়াড় রাজার দেওয়া সংবর্ধনা সভায় হাজির হয় এবং কবিকে নিজেদের জাতের মানুষ বলে চিহ্নিত করেছে। যে রাজা কবিকে রাজসভায় আশ্রয় দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়েছিলেন সেই রাজারই মনে ভীতির সঞ্চার করেছে কবি। ইতর, ছোটজাত যদি কবির মর্যাদা পান তবে হাঁড়ি, মুচি, চামার, ডোম সবাই পাঁচালি লিখবে এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের চরম সর্বনাশ হবে। তাই কবিকে চরম শাস্তি দিলেন রাজা,

> "চুয়াড় হয়ে তুই ব্রহ্মণের নাম নিলি, দেবী বন্দনা রচলি, দেবীর স্বপ্ন, এ নগরে আসবার উপদেশ, তোর প্রতিটি কথা মিথ্যা। আরে, তোকে আজ রক্ষা করে কে?"[১৪]

লেখকের জিজ্ঞাসা মুকুন্দ ব্রাহ্মণ হয়ে যদি অন্ত্যজ জীবন নিয়ে অখ্যান রচনা করতে পারেন, তাহলে অন্ত্যজ সমাজের প্রতিনিধি কলহন কেন ব্রাহ্মণ সমাজের জীবন নিয়ে আখ্যান রচনা করতে পারবে না? মানসিক আঘাতে জর্জরিত কবি ভেঙে না পড়ে সদর্পে বলেছে,

> "হ্যাঁ, একদিন আমি ওদের কলহন ছিলাম। ভুবনে আমার স্থান খুঁজতে যাই বোলে চলে এসেছিলাম। কিন্তু আমি মানুষের সমাজে কোন দোষে দোষী হলাম সেইটি বোলো মহারাজ।"[১৫]

জাতপাত ও বর্ণগত কৌলিন্যের মোহে অন্ধ ও বিশ্বাসী রাজার কাছে কবি তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে,

> "পৈতে পরলে তোমার পৌত্রের দ্বিতীয় জন্ম হয়, সে দ্বিজ হয়। দ্বিজ সেই যার দুবার জন্ম হয়। ...আমি চুয়াড় নই, আমি কবি বন্দ্যঘিটী গাঞ্চিঃ, অভয়া সেবক, এ পরিচয় আমার দ্বিতীয় জন্ম, সেটি কি তোমরা কেড়ে নিতে পারো।"[১৬]

এ ন্যারেশন সমাজকে শিক্ষা দিয়ে যায়। কবির কোনও জাত হয় না। কবিত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারে না। লেখক শুধু রাজা গর্গ বল্লভ বা মাধবাচার্যকে প্রশ্ন করেননি। প্রশ্ন করেছেন আমাদের সমাজকেও এবং সমর্থন জানিয়েছেন কবি বন্দ্যঘটীকেই। অভয়ার বন্দনা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই করতে পারেন। শূদ্র হলে কি মানুষ হয় না। জাতি নয়, ধর্ম নয়, মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। দস্যু রত্নাকর যদি বাল্মীকি হয়ে মানুষের কাছে নমস্য হতে পারেন, তাহলে কবি বন্দ্যঘটী কেন পারবে না? এভাবে জাতপাতের বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজকে লেখক প্রশ্ন করেছেন, যা দেশ-কাল-পাত্রের যে-কোনো প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এমনকি দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে তার সাক্ষ্য মিলবে।

যুদ্ধ ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে সবই সিদ্ধ। প্রেমের কোনও জাত হয় না। প্রেম অন্ধ। প্রেম অজর, অমর ও অক্ষয়। প্রেমের শক্তিতে মানুষ দুর্গমকে সুগম করতে পারে, অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। কিন্তু বর্ণগত কৌলীন্যের কারণে কবি বন্দ্যঘটীর প্রেম পরিণতি লাভ করেনি। মন্ত্রীকন্যা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কবির ব্যর্থ প্রেমের ক্ষেত্রেও রয়েছে জাতিগত বেড়াজালের সুউচ্চ প্রাচীর। কবি বলেছে,

> "ফুল্লরা তাহলে তাকে ভালোবাসেনি! তাঁর সেই রূপ, কবি প্রতিভা, তাঁর বুকভরা ভালোবাসা, কিছুই সত্যি নয় ফুল্লরার কাছে। তিনি যা ছিলেন তাই-ই আছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের উপবীতটি ছিল না বলে ফুল্লরা তাকে এমন করে অস্বীকার করল?"[১৭]

উচ্চবর্গীয় মূল ধারার সংস্কৃতিকে যারা লালন করে তারা চায় না নিম্নবর্গের সমাজ-সংস্কৃতি থেকে কোনও মানুষ খ্যাতি অর্জন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক। কাজেই আলোচ্য উপন্যাসে লেখক দেখাতে চেয়েছেন মুকুন্দ চক্রবর্তী উচ্চবর্ণের কবি হয়েও নিম্নবর্ণের মানুষের জীবকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের নিম্নবর্ণের কবি কলহনের তা সম্ভব হল না। মহাশ্বেতার কবি চুয়াড়। তাই ব্রাহ্মণদের মতো ধর্ম-দর্শন-শাস্ত্র জানলেও দেবী চণ্ডীকে নিয়ে 'অভয়ামঙ্গল' রচনা বাস্তবায়ন হয় না। মহাশ্বেতা দেবী আমাদের আধুনিক শিক্ষিত নাগরিক মনকে, বিবেককে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে হাজির করেছেন। অবহেলিত, ব্রাত্য, প্রান্তিক ও নিম্নবর্ণের মানুষেরা শুধু উচ্চবর্ণের না হওয়ার কারণেই কী আত্মপ্রতিষ্ঠা ও উত্তরণের পথ খুঁজে পাবে না? তাদের উত্তরণের পথ কঠিন থেকে কঠিনতর হবে এবং বঞ্চিত হয়েই থেকে যাবে?

কিন্তু আমরা যাই বলি না কেন, এটাই ঘটনা যে বর্ণশাসিত সমাজব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের দাপটে চুয়াড় কলহনদের কবিত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে না। আসলে মহাশ্বেতা দেবীর এ অভিযাত্রা জীবনের সন্ধান, শেকড়ের অনুসন্ধান, মাটির লড়াই, অধিকারের লড়াই ও অস্তিত্বের লড়াই। বর্ণগত কৌলীন্যের প্রতাপ ও প্রভুত্ব স্বাধীনতার পরেও জারি আছে। তাই ভারতীয় সংবিধান, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকার, পুলিশ ও প্রশাসনকে মহাশ্বেতা দেবী তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। বাতানুকুল সংসদ ভবনের কাঁচের ঘরে শোভা পায় মহামূল্যবান ভারতীয় সংবিধান। তাতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে নাগরিকদের বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভারতবর্ষের জায়মান বাস্তব অন্য কথা বলে।

Reference:

১. Guha, Ranajit. Subaltern Studies I. Oxford University Press, 1982, p. 8
২. দেবী, মহাশ্বেতা, এক জীবনেই, প্রমা, মাঘ, ১৪০২, পৃ. ৩৫
৩. দেবী, মহাশ্বেতা, আমি/আমার লেখা, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ (বিকল্প সূত্র-রহমান, আনিসুর, মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নিম্নবর্গের উলগুলান, কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ. ১৮২
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, সাক্ষাৎকার ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৩, অমৃতলোক, ২০০৫, (বিকল্প সূত্র-রহমান, আনিসুর, মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নিম্নবর্গের উলগুলান, কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ. ১৮৩

৫. দেবী, মহাশ্বেতা, বিনীত নিবেদন, আঁধার মানিক, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৬৬
৬. দেবী, মহাশ্বেতা, টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা, ভূমিকা, মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র ১৫, কলকাতা : দে'জ, ২০০৪, পৃ. ২২৭-২২৮
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, ভূমিকা, ব্যাধখণ্ড, কলকাতা : দে'জ, ১৯৯৪
৮. গায়ত্রী চক্রবর্তীর সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার : Imaginary Maps, বিকল্প সূত্র- ঘোষ, নির্মল, মহাশ্বেতা দেবী : অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ৩৭
৯. দেবী, মহাশ্বেতা, লেখকের কথা, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : দে'জ, ২০১১
১০. দেবী, মহাশ্বেতা, লেখকের কথা, কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু, কলকাতা : করুণা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, (মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, দেজ, ২০২০, পৃ. ৪৮৯, বকলমে কলেজ স্ট্রিট।
১১. তদেব, পৃ. ৩০
১২. তদেব, পৃ. ১০৯
১৩. তদেব, পৃ. ৭৩
১৪. তদেব, পৃ. ১০৯
১৫. তদেব, পৃ. ১০৬
১৬. তদেব, পৃ. ১১০
১৭. তদেব, পৃ. ১৪৫